যদিও পুরাতনপন্থী চীনা ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, মাঞ্চুদের উত্থানের সময়ে যখন পাশ্চাত্য পর্যটকেরা চীনে আসতে থাকেন, তখন থেকেই চীনের সাথে পশ্চিমের যোগাযোগ গড়ে উঠতে শুরু করেছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে যোগাযোগ ছিল খুবই ক্ষীণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে কখনোই চীনের দরজা পাশ্চাত্য দুনিয়ার সামনে উন্মুক্ত হয়নি। তখন থেকেই বিভিন্ন পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী দেশ নিজেদের সমৃদ্ধিশালী করার তাগিদে চীনে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অবলম্বন করেছিল। সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব চীনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল। একদিকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ চীনে প্রভাব বিস্তার করে চীনের ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করেছিল। চীন একটি আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে চীনের জনগণ সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রায় শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল—১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সে-সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। তাই সবদিক দিয়ে বিচার করলে, প্রথম অহিফেন যুদ্ধের সময়েই চীন আধুনিক যুগে পদার্পণ করেছিল বলা যেতে পারে।

১.২ ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে চীন

ভৌগোলিক আয়তন এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে, ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চীন ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ। বর্তমান গণতান্ত্রিক চীনের অন্তর্গত ৯ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার অঞ্চলের থেকে অনেক বেশি এলাকা নিয়ে তৎকালীন চীনরাজ্য গঠিত ছিল। আমুর থেকে উসুরি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল, বহির্মঙ্গোলিয়া, অন্তর্বর্তী মঙ্গোলিয়া, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চল চীনের অন্তর্গত ছিল। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে চীনের মোট জনসংখ্যা ছিল ৪১০ মিলিয়ন।

এই বিশাল সাম্রাজ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল পাশ্চাত্য দুনিয়ার সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। মার্কো পোলোর মতো মধ্যযুগীয় পর্যটক থেকে আরম্ভ করে ভলটেয়ার, ডিডারো প্রভৃতি অষ্টাদশ শতকীয় দার্শনিকরা সকলেই চীনা সভ্যতার বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। চীনারা নিজেরাও তাঁদের সভ্যতার বিশেষত্বের বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। নিজেদের দেশের স্বাতন্ত্র্য বোঝানোর জন্য তাঁরা চীন দেশকে ঝংগুয়ো (Middle Kingdom) বা মধ্য রাজ্য এবং ঝংঘুয়া (Central Civilisation) বা কেন্দ্রীয় সভ্যতা বলে অভিহিত করতেন।

জগৎ সম্পর্কে চীনাদের দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিবাদ (Creationism) বা অদ্বৈতবাদ (Monism)—কোনোটির দ্বারাই পরিচালিত ছিল না। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিটি সামাজিক এবং প্রাকৃতিক ঘটনারই দুটি বিপরীতমুখী অথচ পরিপূরক দিক আছে। একটি ইন (Yin) এবং অপরটি ইয়াং (Yang), উদাহরণ—নারী-পুরুষ, রাত্রি-দিন, চন্দ্র-সূর্য, সক্রিয়-নিষ্ক্রিয় প্রভৃতি। এই ইন এবং ইয়াং-এর ধারণার মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের একটি প্রাথমিক রূপরেখা চোখে পড়ে। অনেকে বলেছেন—দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে একটি প্রাথমিক ধারণা থাকার ফলে চীনাদের পক্ষে মার্কস্‌বাদ গ্রহণ করা সহজসাধ্য ছিল।

১.৩ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে চীনের শাসনব্যবস্থা

১.৩.১ কেন্দ্রীয় শাসন

প্রাক্-আধুনিক চীনে ক্ষমতার সর্বোচ্চস্তরে ছিলেন চীন সম্রাট। চীনে সম্রাটের ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করা হত। সম্রাটকে বলা হল 'স্বর্গের সন্তান'। প্রচলিত ধারণা অনুসারে তিনি প্রকৃতি ও মানব সমাজের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করতেন। স্বর্গের অনুশাসনের (তিয়েন মিং) মাধ্যমে তিনি এই কর্তৃত্ব অর্জন করেছিলেন। তবে স্বর্গের অনুশাসন অপরিবর্তনীয় ছিল না। রাজকর্মচারীদের দুর্নীতি এবং সম্রাটের অপদার্থতা প্রকট হয়ে উঠলে, সমাজের স্বার্থে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ করার সীমিত অধিকার চীনা ঐতিহ্যে স্বীকৃত ছিল। এ ধরনের ধ্যানধারণা কনফুসীয় ভাবধারার মধ্যে নিহিত ছিল।

চীনা শাসনতন্ত্রে সরকারি কর্মচারীদের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁদের বলা হত 'ম্যান্ডারিন' (Mandarin)। সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তাঁরাও সম্রাটের সঙ্গে স্বর্গের অনুশাসন লাভের অংশীদার ছিলেন। একজন ম্যান্ডারিনকে শাসনতান্ত্রিক বিষয় সম্পর্কে যত না জানতে হত, তার চেয়ে ধ্রুপদী চীনা ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর অধিকতর জ্ঞান বাঞ্ছনীয় ছিল। ম্যান্ডারিনকে একজন বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার ছিল না। কাম্য ছিল তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হবেন।

১৩৮০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ জনৈক মিং সম্রাট প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর তুলে দিয়ে সচিবালয় বা নেই-কো প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল এই সচিবালয়। যাবতীয় রাজকীয় আদেশ এবং ঘোষণা এই সচিবালয় থেকেই জনসমক্ষে পাঠানো হত। চিং সম্রাট কাং-শির রাজত্বকালে সচিবালয়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মহাপরিষদ বা Grand Council গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

সচিবালয়ের গুরুত্ব একেবারে কমে যায়। এই নতুন প্রতিষ্ঠান সচিবালয়ের যাবতীয় রাজনৈতিক এবং সার্বভৌম ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। যে সময় সচিবালয় থেকে ক্ষমতা মহাপরিষদের হাতে চলে যায় সে সময় চীনের সম্রাট ছিলেন ইয়ুং-চেং (১৭২৩-৩৫)। এই মহাপরিষদের সদস্যরা সকলেই ছিলেন সম্রাট ইয়ুং-চেং-এর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। সদস্যদের সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত সীমিত। এই সীমিত সংখ্যক সদস্যের পরামর্শ নিয়েই সম্রাট তাঁর শাসনতান্ত্রিক ও সামরিক পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতেন। ইম্যানুয়েল সু বলেছেন—চিং স্বৈরতন্ত্রের বিকাশে মহাপরিষদ প্রতিষ্ঠানটির সৃষ্টি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল।

চীনে প্রাদেশিক সরকারগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে ৬টি বোর্ড গঠিত হয়েছিল। এই ৬টি বোর্ডের সভাপতি ও সহ-সভাপতিরা মহাপরিষদের সদস্য হতেন। তাছাড়া অসামরিক প্রশাসনের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও মহাপরিষদের সদস্য থাকতেন। মহাপরিষদের সদস্যপদ ছিল পুরোপুরি অবৈতনিক। তবে তাঁরা তাঁদের মূলপদের জন্য বেতন পেতেন। মহাপরিষদের বার্ষিক খরচ ছিল ১০,৫০০ থেকে ১১,০০০ টেইল।

মহাপরিষদের সদস্যদের অধীনে ৩২ জন সচিব থাকতেন। এদের মধ্যে ১৬ জন চীনা এবং ১৬ জন মাঞ্চু। নিয়মিত প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন এই সচিবেরা। সচিবদের 'ক্ষুদে কাউন্সিলর' (Little Councillor) বলা হত। চিং শাসনকালে ৩৪ জন সচিব মহাপরিষদের সদস্যপদ লাভ করেছিলেন। চীন সম্রাট সবসময়ই আশা করতেন যে তাঁর মহাপরিষদ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করবে, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দ্রুত গ্রহণ করবে, সেই সিদ্ধান্ত যতদূর সম্ভব গোপন রাখবে এবং সম্রাটের সঙ্গে প্রদেশগুলির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে।

সচিবালয় এবং মহাপরিষদের পরবর্তী স্তরে ছিল ৬টি বোর্ডের স্থান। এই ৬টি বোর্ড ছিল কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মেরুদণ্ড। এই বোর্ডগুলি ছিল অসামরিক প্রশাসনিক দপ্তর (লি-পু), রাজস্ব দপ্তর (হু-পু), যুদ্ধ সংক্রান্ত দপ্তর (পিং-পু), শাস্তিদান সংক্রান্ত দপ্তর (শিং-পু), জনকল্যাণ দপ্তর (কুং-পু) এবং আচার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত দপ্তর (লু-পু)। প্রতিটি বোর্ডে ২ জন সভাপতি এবং ৪ জন সহ-সভাপতি থাকতেন। চীনা ও মাঞ্চুদের মধ্যে এই পদগুলি সমানভাবে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি বোর্ডের অধীনে ৪টি করে কেন্দ্র থাকত। কেবলমাত্র রাজস্ব দপ্তরের ১৪টি এবং শাস্তিদান সংক্রান্ত দপ্তরের ১৮টি কেন্দ্র ছিল। আশ্চর্যজনকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো বৈদেশিক দপ্তর ছিল না। এর প্রধান কারণ ছিল যে, কনফুসীয় ধারণা অনুযায়ী

চীনারা কোনো দেশের সঙ্গে সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল না। তাই বৈদেশিক দপ্তর রাখার প্রয়োজনীয়তা চীনা কর্তৃপক্ষ অনুভব করেনি।

সচিবালয়, মহাপরিষদ এবং ৬টি বোর্ড এগুলি ছিল চীনের কেন্দ্রীয় শাসনের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু এগুলি ছাড়াও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ রক্ষাকারী কার্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল চিং সেন্সরেট (Ching Censorate)। চিং সেন্সরেটে ২ জন প্রবীণ সভাপতি, ৪ জন প্রবীণ সহ-সভাপতি, ২ জন নবীন সভাপতি এবং ৪ জন নবীন সহ-সভাপতি থাকতেন। ৬টি বোর্ডের অধীনে ২৪ জন সেন্সর ছিলেন, আর প্রদেশগুলির জন্য ৫৬ জন সেন্সর থাকতেন। উপরোক্ত পদগুলি চীনা ও মাঞ্চুদের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত ছিল। সেন্সরদের কাজ ছিল সরকারি কর্মচারীদের কাজকর্মের উপর নজরদারি করা। কেউ কর্তব্য কর্মে অবহেলা করলে, সেন্সররা তা সম্রাটের দরবারে জানিয়ে দিতেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল হানলিন অ্যাকাডেমি। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল মূলত পড়াশোনা সংক্রান্ত। অ্যাকাডেমির ২ জন চ্যান্সেলর থাকতেন—১ জন চীনা এবং ১ জন মাঞ্চু। তাঁরা সম্রাটকে বিভিন্ন ধ্রুপদী সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করতেন এবং সম্রাটের বক্তৃতা দেওয়ার বিষয় লিপিবদ্ধ করে দিতেন। হানলিন অ্যাকাডেমির অধীনে একটি চমৎকার গ্রন্থাগার ছিল। মূল্যবান পুস্তক ছাড়াও নানা গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও স্মৃতিকথা এই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত থাকত। হানলিন গ্রন্থাগারের অধীনে রাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিকের কার্যালয় ছিল। ঐতিহাসিকরা প্রত্যেক সম্রাটের রাজত্বকালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতেন এবং রাজত্বকাল সংক্রান্ত নথিপত্র সংরক্ষিত রাখতেন। তাছাড়া ঐতিহাসিকরা সম্রাট, সম্রাজ্ঞী ও গুরুত্বপূর্ণ অভিজাত ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের জীবনীও লিখতেন। কেবলমাত্র মেট্রোপলিটন সাম্মানিক স্নাতকরাই অ্যাকাডেমির সদস্য হতে পারতেন। এরা প্রত্যেকেই ছিলেন ভালো ছাত্র। অ্যাকাডেমিতে সাফল্যের সঙ্গে কিছুদিন কাজ করার পর অনেক সময়ই তাদের পদোন্নতি ঘটত। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের উচ্চতম স্তরে অ্যাকাডেমির অনেক সদস্যই উন্নীত হয়েছিলেন।

বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চীনের আইন প্রণীত হয়েছিল। মাঞ্চুদের শাসনকালে বিশেষ অপরাধের জন্য বিশেষ ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। বিচারকার্য পরিচালনার সময় সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত। বিচার প্রার্থীদের মধ্যে কে সঠিক এবং কে ভ্রান্ত—সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হত না। সামাজিক শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং সম্রাটের কর্তৃত্বের বিরোধিতা সব থেকে বড়ো

অপরাধ বলে গণ্য করা হত। মৃত্যুদণ্ডের প্রচলন ছিল। এর পরবর্তী স্তরের শাস্তি ছিল নির্বাসন। শাস্তি হিসাবে দৈহিক অত্যাচার স্বীকৃত ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই সন্দেহভাজন ব্যক্তির পরিবারভুক্ত কোনো সদস্যকেও দৈহিক নির্যাতন করা হত। নাগরিকের ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার বিষয়টির থেকে সমাজের কল্যাণের দিকে অধিকতর নজর রেখে চীনে আইন ও দণ্ডব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়েছিল। তবে নাগরিকদের ব্যক্তিগতভাবে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা দায়ের করার অধিকার ছিল।

১.৩.২ আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা

চিং শাসনকালে গোটা চীনদেশ ১৮টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশগুলি বিভক্ত ছিল ৯২টি সার্কিটে। সার্কিটগুলি বিভক্ত ছিল ১৭৭ থেকে ১৮৫টি প্রিফেক্‌চারে। আবার প্রিফেক্‌চারগুলি বিভক্ত ছিল প্রায় ১৫০০ জেলা ও ডিপার্টমেন্টে। ১৮টি প্রদেশের শাসনের দায়িত্বে থাকতেন গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরেরা। চিহ্‌লি এবং সেচওয়ান এই ২টি প্রদেশ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ২ জন করে গভর্নর জেনারেল ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে এক একজন গভর্নর জেনারেলের দায়িত্বে একাধিক প্রদেশ থাকত। গভর্নর জেনারেলের কাজে সাহায্য করতেন গভর্নরেরা। পিকিং-এর রাজদরবার মাঞ্চু ও চীনাদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রেখে চলার পক্ষপাতী ছিল। যদি কোনো প্রদেশের গভর্নর জেনারেল মাঞ্চু হতেন, তবে সেই প্রদেশের গভর্নর অবশ্যই হতেন একজন চীনা। আবার অন্য ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টোটাই ঘটত। অষ্টাদশ শতকের অন্তিম লগ্নে শতকরা ৫৭ জন গভর্নর জেনারেল ছিলেন মাঞ্চু এবং শতকরা ৪৩ জন ছিলেন চীনা।

প্রত্যেক গভর্নরের অধীনে একজন করে অর্থসংক্রান্ত, বিচারবিভাগীয় এবং শিক্ষানীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিশনার থাকতেন। তাঁদের সকলকেই নিযুক্ত করতেন সম্রাট স্বয়ং। প্রত্যেক কমিশনারের অধীনস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ করত সরকার। তবে তাঁদের বেশ কিছু ব্যক্তিগত কর্মচারীও ছিল। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে লবণ বাণিজ্য, শস্য পরিবহন, আবগারি, নদীপথে যাতায়াত ইত্যাদি বিষয় দেখাশোনা করার জন্য সরকার একদল বিশেষ কমিশনার নিযুক্ত করত। একজন প্রাদেশিক সৈন্যাধ্যক্ষ এলাকার সামরিক বিষয়গুলির তত্ত্বাবধান করতেন।

আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে কমিশনারদের পরবর্তী স্তরে ছিল সার্কিট ইনটেনডেন্ট (Circuit Intendent) ও প্রিফেক্ট (Prefect)-দের স্থান। সার্কিট ও প্রিফেক্‌চারের পরবর্তী ক্ষুদ্রতর একক ছিল জেলা। জেলাগুলির প্রশাসনিক দায়িত্ব

অর্পিত ছিল জেলাশাসকদের ওপর। জেলাশাসকদের কাজ ছিল কর আদায় করা, মামলা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করা এবং এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা। জেলাশাসককে বলা হত 'ফু-সু কুয়ান' বা 'বাপ-মা পদাধিকারী' (Father-mother official)। জেলাশাসকদের সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখে চলতে হত এবং তাদের চাহিদার প্রতি নজর রাখতে হত বলেই সম্ভবত তাদের উক্ত নামে ডাকা হত। স্থানীয় বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে জেলাশাসক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখতেন। এই গোষ্ঠী বেসরকারি স্থানীয় আমলা হিসাবে কাজ করে জেলাশাসককে প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করত। এই গোষ্ঠী মোট ৬টি ভাগে (ফ্যাং) নিজেদের সংগঠিত করেছিল। সেই ভাগগুলি ছিল—(১) প্রশাসনিক ও অসামরিক বিষয়, (২) আদমশুমার ও কর ব্যবস্থা, (৩) রীতিনীতি ও উৎসব অনুষ্ঠান, (৪) সামরিক বিষয়, (৫) অপরাধ ও আইনশৃঙ্খলা এবং (৬) জনকল্যাণ। উপরোক্ত আমলারা জেলাশাসকের কাছ থেকে কোনোরকম বেতন পেতেন না। কিন্তু তাঁরা একধরনের অধিকর (surcharge) জনসাধারণের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। এই আদায়ীকৃত অংশের একটা তারা জেলাশাসকের কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং অবশিষ্ট অংশ নিজেরা ভোগ করতেন।

জেলার থেকে সামান্য বড়ো শাসনতান্ত্রিক এককের অস্তিত্ব প্রাক্-আধুনিক চীনে ছিল। এগুলিকে বলা হত ডিপার্টমেন্ট বা চৌ এবং সাব-প্রিফেক্চার বা তিং। কতকগুলি ডিপার্টমেন্ট প্রাদেশিক সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। সাধারণ ডিপার্টমেন্টগুলি অপেক্ষা এই ডিপার্টমেন্টগুলি কিছুটা বেশি মর্যাদা উপভোগ করত।

প্রত্যেকটি জেলা আবার কতগুলি গ্রামে (চুয়াং), নগরে (চোং), শহরে (চেন), গ্রামভিত্তিক বসতি (শিয়াং) এবং গ্রামীণ বাজারে (শি) বিভক্ত ছিল। এই গ্রামীণ এককগুলি শাসনের দায়িত্বে থাকতেন স্থানীয় অধিবাসীরা। সরকারি কর্মচারীরা গ্রামীণ শাসনের দায়িত্বে থাকতেন না বললেই চলে। বস্তুত সাম্রাজ্যিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা জেলাস্তরেই থেমে গিয়েছিল। যেহেতু গ্রামীণ স্তরে স্থানীয় অধিবাসীরা শাসনের দায়িত্বে থাকতেন, সেহেতু গ্রাম, নগর ও শহরগুলি যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করত। তবে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় দুটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যিক সরকার আঞ্চলিক প্রশাসনে কিছুটা হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছিল। ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পাও-চিয়া পুলিশী ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত এবং ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত লি-চিয়া কর আদায়ে সাহায্য করত। পাও-চিয়ার

প্রধানকে বলা হত পাও-চাং। এলাকার অপরাধমূলক ঘটনা এবং গুপ্ত ষড়যন্ত্রের খবর সংগ্রহ করতেন পাও-চাং। তিনি তাঁর কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে তাঁকে অনেক সময় কঠোর শাস্তি পেতে হত। গ্রামাঞ্চলে ১১০টি পরিবার নিয়ে একটি লি গঠিত হত। লি-চিয়ার প্রধানকে বলা হত লি-চাং। সাধারণত অধিক পরিমাণে করদাতা কোনো বয়স্ক ব্যক্তিকে লি-চাং পদে নিযুক্ত করা হত। কর আদায়ের বাইরে তারা আদমশুমার (Census) প্রস্তুত করতেন এবং কর আদায়কারীদের নথিপত্র সংরক্ষিত রাখতেন। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দের পর লি-চাং-দের দায়িত্ব অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। দ্রুত কর আদায়ের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত হয়েছিল।

গ্রামীণ সমাজের নিম্নতম স্তরে ছিল বাধ্য, শান্ত ও পরিশ্রমী কৃষকদের অবস্থান। এই কৃষকরা সারাবছর ধরে সামান্য উদরপূর্তির জন্য অসম্ভব পরিশ্রম করতেন। তার উপরে তাঁরা ছিলেন করভারে জর্জরিত। অনেক সময় কোনো শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর মানুষের অনুপ্রেরণায় তাঁরা স্থানীয় সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন। কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যিক সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার সর্বদাই কৃষক অভ্যুত্থান এড়িয়ে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই অনেক সময় সরকার কৃষকদের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করত এবং খারাপ ফলন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বছরে তাদের কর ছাড় দিত।

১.৩.৩ চীনের অর্থনীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থা

প্রাচীন কনফুসীয় ঐতিহ্য অনুসারে চীনদেশে একটি কথা প্রচলিত ছিল। কথাটির অর্থ—কৃষির প্রতি মর্যাদা দেখাও, বাণিজ্যকে ঘৃণা কর। এ কথার থেকে বোঝা যায় যে প্রাক্-আধুনিক চীনে বাণিজ্য যথেষ্ট অবহেলিত ছিল। কৃষিকে গুরুত্ব দেওয়া হত অনেক বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে চীনে হস্তশিল্প ও মাঝারি দূরত্বের বাণিজ্য দৈনন্দিন আর্থিক জীবনে কিছুটা স্থান করে নিতে পেরেছিল।

উনিশ শতকে চীনের অর্থনীতি ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগণ্য কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। সমগ্র জনসংখ্যার পাঁচভাগের চারভাগ কৃষির সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রচুর পরিমাণে এবং বিভিন্ন ধরনের শস্য চীনে উৎপাদিত হত। দক্ষিণ ও মধ্য চীনে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন হত। উত্তর চীনে উৎপন্ন হত গম, ভুট্টা, চা, সয়াবিন, বাদাম ইত্যাদি শস্য। তাছাড়া তুঁত, তুলা, শন, তৈল উৎপাদনকারী নানা ধরনের চারা ইত্যাদি চাষেরও প্রচলন ছিল চীনে। উপরোক্ত শস্যগুলি হস্তশিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। চীনের বনাঞ্চলে নানা ধরনের বন্য বৃক্ষের অস্তিত্ব ছিল। এই সমস্ত বৃক্ষ থেকে বার্নিশ, ওষুধ ইত্যাদি তৈরি হত। চীনের কৃষি ব্যবস্থা

ছিল পুরোপুরি শ্রমনির্ভর (Labour intensive)। কৃষির ওপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও মাঞ্চু শাসনাধীন প্রাক্-আধুনিক চীনে কৃষির তেমন উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেনি। ১৬৬১ খিস্টাব্দ নাগাদ চীনে মোট আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ৫৪৯ মিলিয়ন মৌ। ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে আবাদি জমির পরিমাণ বেড়ে হয়েছিল মাত্র ৭৪১ মিলিয়ন মৌ।

রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি-রাজস্ব এবং মাথট কর (Poll Tax)। তাছাড়া লবণের উপর কর, চায়ের উপর কর, বাণিজ্যিক লাইসেন্সের উপর কর ইত্যাদি থেকেও রাষ্ট্রের আয় হত। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ভূমি থেকে আসা কর। সমগ্র রাজস্বের ৭৫ শতাংশ আসত ভূমি-রাজস্ব থেকে। এর থেকেই রাজপ্রাসাদের খরচ, সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয় এবং সেনাবাহিনীর খরচ চালানো হত। ফলে অনেক সময়ই কৃষকদের ওপর চরম উৎপীড়ন চালিয়ে তাদের কাছ থেকে কর আদায় করা হত। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকেরা ইয়ামেন (Yamen) বা স্থানীয় প্রশাসনিক কেন্দ্রের কর্মচারীদের অসততা ও মিথ্যাচারের শিকার হতেন। তাম্রমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে মূল্যের ঘনঘন পরিবর্তনের ফলে অশিক্ষিত কৃষকদের প্রতারণা করা অত্যন্ত সহজ ছিল। অষ্টাদশ শতকের অন্তিমলগ্ন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে নগদ টাকায় কর দেওয়া যেত। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, তৎকালীন চীনে নগদ টাকার ওপর ভিত্তি করে একটি আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। কর ভারে জর্জরিত থাকার ফলে এবং সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি ও অত্যাচারের শিকার হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে চীনে কৃষকদের অত্যন্ত দরিদ্র জীবনযাপন করতে হত। তার ওপর খরা, বন্যা, মহামারী ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্বিপাক প্রায়ই চাষের ক্ষতি করত। ফলে কৃষকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হত, কারণ রাজকর্মচারীরা সময়মতো রাজস্ব আদায় করতে ছাড়তেন না। পিকিং-এর রাজদরবারে কৃষকদের অসন্তোষের খবর পৌঁছলে অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করত। কিন্তু খবর সব সময় পৌঁছাত না। এই প্রতিকূল পরিস্থিতি কৃষকদের বিক্ষোভ ও অসন্তোষ বাড়িয়ে তুলেছিল, যার অনিবার্য পরিণতি ছিল একের পর এক কৃষক বিদ্রোহ।

১.৪ সামাজিক স্তরবিন্যাস

চীনা সমাজে পেশাগত বিভাজনের ভিত্তিতে চারটি স্তরের উল্লেখ পাওয়া যায়। (১) পণ্ডিত রাজকর্মচারী বা পণ্ডিত ভদ্রলোক (Scholar official বা Scholar gentry)। এদের বলা হত শি। (২) কৃষক (নং), (৩) কারিগর (গং), এবং